দৈনিক খবর

05

তারিখ 02 FEB 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

আঞ্চলিক সহযোগিতা গড়তে সার্ক সফল হবে কি?

● নাড়ু গোপাল ঘোষ ●

দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা বা সার্কের ঢাকা অধিবেশন স্থগিত হয়ে গেলো। ইতিপূর্বে '৯০ সালে কলম্বো অধিবেশন স্থগিত হয়ে যায় এক বছরের জন্য। উপমহাদেশের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে নতুন কোন বিস্ফোরণ না ঘটলে আগামী মার্চ মাসে স্থগিত অধিবেশন হওয়ার কথা। কিন্তু সেই অধিবেশন সার্ক চুক্তিভুক্ত দেশগুলোর শতাধিক কোটি মানুষের জন্য কি কল্যাণ নির্দেশ করবে?

শাসন ক্ষমতায় ব্যর্থ স্বৈরতান্ত্রিক শাসকেরা গণতন্ত্রের কথা বলেন। কিন্তু গণতন্ত্রের কথা ভাবেন না। গণতন্ত্রে তাঁদের ভয় আছে। শঙ্কাও আছে। আছে গদিচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা। সেই ভয়, শঙ্কা এবং আশংকা থেকে নিজের অবস্থানকে সাময়িক ঠেকা দেয়ার প্রয়োজনে তবুও গণতন্ত্রের কথা বলতে হয়। যদিও বলা এবং করার মধ্যে থাকে বিস্তর ব্যবধান।

সার্কের ধারণা একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। কিন্তু এর প্রধান দুই উদ্যোক্তা কেউই গণতান্ত্রিক শাসক ছিলেন না। গণমানসকে ধোঁকা দিয়ে নিজেদের অবস্থানকে সাময়িকভাবে হলেও ঠেকা দেয়ার জন্যই তাঁদের ঐ সংস্থাটি গঠন করার মূল লক্ষ্য ছিল। সে কাজে তাঁরা কিছুটা সফলও হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেননি। '৮৫ থেকে '৯২ সাল মাত্র সাত বছরের মধ্যেই একে একে বিদায় নিয়েছেন দুই প্রধান উদ্যোগীসহ পাঁচজন শাসকই। ঝিঁকে আছেন কেবল মাত্র মালদ্বীপের গায়ুম সাহেব আর ভুটানের রাজা। এটা আমি ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখছি না বা কাউকে অহেতুক দায়ীও করছি না, যা বাস্তব তাই বলছি।

'৮৫ সালের ৭ই ডিসেম্বর ঢাকার সংসদ ভবনে সার্কের উদ্বোধনী বা প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে যে সকল রাষ্ট্রপ্রধান উপস্থিত ছিলেন '৯২ সালের ঢাকার স্থগিত অধিবেশন এবং '৯৩-এর কোন এক সময়ে অনুষ্ঠিতব্য অধিবেশনে তাঁদের দেখা যাবে না। তার থেকেও বড় কথা প্রতিশ্রুত সহযোগিতার গরহাজিরা। উদ্যোগী রাষ্ট্রনায়কদের দেখা না গেলেও দেখা যাবে সার্কের উপস্থিতি। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে ঐ সংস্থাটির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল সেই সহযোগিতা গড়ে উঠেনি। তা গড়ে উঠলে এবং শক্তিশালী হলে দক্ষিণ এশিয়ার শতাধিক কোটি মানুষ শুধু উপকৃত হতেন না, এক কথায় বেঁচে যেতেন। মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের অভাব থাকতো না। ধাপ্পাবাজ শাসকদের সেখানেই বিপদ। ভাত-কাপড়ের সমাধান হলে গণতন্ত্র আসবেই শুধু নয়, তা শক্তিশালীও হবে। যা তাদের অনেক বিপদের মধ্যে আর একটা বিপদই বৃদ্ধি করবে।

কিন্তু কেন? বাংলাদেশে এরশাদ সাহেব গায়ের জোরে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার পর জনগণকে ধোঁকা দিতে গণতন্ত্রের অভিনয় করতে হয়েছিল। থানাগুলোকে উপজেলায় রূপান্তরিত করার পরই সেগুলোকে নিজের ক্ষমতার ঘাঁটি হিসেবে গড়ে তুলতে নির্বাচনের আয়োজন করলেন। বিরোধী দলগুলো সেই নির্বাচন বয়কট করে। বছরখানেক পর আবার এরশাদ সাহেব সে কাজে ব্রতী হলে বিরোধীরা আর বৈরী হননি। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি অনিবার্য। কিন্তু উপজেলা পরিষদ নির্বাচন হল একেবারে নির্দলীয় প্রথায়। গণতন্ত্রের বিরোধী হলেও ও দেশের বিরোধী দলগুলো তা গ্রহণ বা বর্জন কোনটাই না করে ক্ষেত্রবিশেষে দলের লোকজনদের দাঁড় করিয়ে দিলেন। তাদের কেউ কেউ নির্বাচিতও হন। তবে প্রশাসনিক ক্ষমতার জোরে এরশাদ সাহেবই সেই নির্বাচনের ঘোলা জলে সব মাছ ঘরে তুলে নেন এবং তা দিয়ে তিনি বিশ্বকে দেখাতে চেষ্টা করেন নামে ফৌজী শাসক হলেও আসলে তিনি একজন গণতন্ত্রীই। বিশ্বের কেউ তা শোনে, কেউ শোনে না।

স্বৈরতান্ত্রিক শাসক গণতান্ত্রিক শাসক সাজতে গিয়ে বুঝলেন জনমতকে ধোঁকা দেয়ার এ পথ সহজ নয়, তাই তিনি নতুন একটা মঞ্চের সন্ধান করতে সচেষ্ট হলেন। যদিও '৮৪ সালের ৮ই জুলাই সার্ক গঠনের প্রস্তাব মালদ্বীপে ৭টি দেশের সভায় অনুমোদিতহয়েছিল।

আর এক জঙ্গী ফৌজী নায়ক পাকিস্তানের জেনারেল জিয়াউল হককে ৭ জন জেনারেল টপকে প্রধান সেনাপতিত্বে বরণ করেছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। যে নিয়োগের মধ্যে দেশের স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তি ভুট্টো সাহেবের ক্ষমতায় টিকে থাকার স্বার্থই ছিল বড়। কিন্তু তিনিও বুঝতে পারলেন তা ভুল এবং বুঝলেন '৭৭ সালের ৫ই জুলাই রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানে যখন তিনি বন্দী হলেন। তারই ক্ষমতার প্রহরী জেনারেল জিয়া। তার ফৌজী বেওনেটের ডগায় হত্যা করলেন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে। গ্রেফতার করলেন গণতন্ত্রের নায়ককে। গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফৌজী শাসন চালু করতে জারি করালেন সামরিক আইন। দেশের বিচার ব্যবস্থা ঠান্ডা ঘরে পাঠিয়ে আদেশ জারি করা হল। তাঁর ইচ্ছা এবং আদেশই আইন। বিচারের নামে অবিচার করে ফাঁসিতে লটকালেন ভুট্টো সাহেবকে। পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্টের আদেশও তাঁর ইচ্ছার কাছে প্রত্যাখ্যাত হল। ফাঁসির শেষ প্রহরে তাঁকে কনডেম সেলের মধ্যেই দৈহিক নির্যাতন করে শেষ স্বাক্ষর আদায় করে নেয়ার চেষ্টা হল ভুট্টো সাহেবের আদেশেই সে দেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে। ভুট্টো কন্যা বেনজির দাবী করেছেন যে, কনডেম সেলের মধ্যে তাঁকে খুন করা হয়েছিল। ভুট্টো সাহেবের সরকার গণতান্ত্রিক ছিল কি-না বা থাকলে কতটা সে নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু সামরিক অভ্যুত্থান করে ক্ষমতা দখল করা এবং ক্ষমতাচ্যুত রাষ্ট্রনায়ককে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের আদেশ অমান্য করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়া এবং তাও আইনকে উপেক্ষা করে করতে যাদের বাধেনি তারা কোনমতেই গণতান্ত্রিক হতে পারেন না। অনেক সময় স্বৈরতান্ত্রিক সরকারকে সামরিক অভ্যুত্থানে হটিয়ে সেনাবাহিনীই দেশের শাসনভার গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দিয়েছে। পাকিস্তানের প্রতিবেশী দুই রাষ্ট্র ইরান ও আফগানিস্তানে তা ঘটেছেও।

রাইফেলের জোরে ক্ষমতা দখল এবং রাষ্ট্রনায়ককে বন্দী করেও ফৌজী দানব জিয়াউল হক সুখে ছিলেন না। স্বল্পকালীন শাসনকালে ভুট্টো সাহেব জনজীবনের কোন সমস্যার সমাধান করতে পারেননি একথা সত্য, তবু তিনি রুটি-কাপড় আওর মোকামের ধ্বনি তুলে সাধারণ মানুষের মনে একটা প্রত্যাশা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। জেনারেল জিয়ার ভয় সেই প্রত্যাশাকে। সেই ভয়েই তিনি যে গণতন্ত্রকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে সামরিক উত্থানের মধ্যদিয়ে ক্ষমতা দখল করেছিলেন সেই গণতন্ত্রকে কবরস্থ করে ইসলামের ধুয়ো তুললেন। সেই ভয়েই তিনি আইনের বিধানকে তোয়াক্কা না করে ভুট্টো সাহেবকে ফাঁসি দিলেন। সেখানেও ভয়। ভীতসন্ত্রস্ত জিয়া এবার ইসলামের বিধানকে অগ্রাহ্য করে বন্দী করলেন দুই ভুট্টা রমণী মা নুসরাত ও মেয়ে বেনজিরকে। তাঁদের প্রিয়জনের মৃত দেহও দেখার সুযোগ দেয়া হল না। বার কয়েক নির্বাচনের দিন ঘোষণা করার পরও জিয়ার বহু ঘোষিত নির্বাচন হল না। যেমন হয়নি তার পূর্বসুরি আইয়ুব খানের আমলে।

'৮৫ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী ২২ জন সামরিক অফিসারকে সামরিক আদালতে অভিযুক্ত করেও জেনারেল জিয়া নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারেননি। তাই সার্কের মধ্যেই খুঁজে পেলেন একটা নিরাপত্তার ছায়া। এরশাদের মত জিয়াও সার্কের ঢাকা অধিবেশনের পর পরই ২৯শে ডিসেম্বর সামরিক শাসনের অবসান ঘোষণাকরলেন।

শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রনায়ক জয়বর্ধনের সমস্যা অন্য। শতাব্দীর অভিশাপ তামিলদের নাগরিকত্বের আন্দোলন দেশের উত্তরে বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম দিয়েছে। উত্তরের জাফনায় যার কেন্দ্র। গোটা উত্তরের তামিল জনতা তাঁদের জ্ঞাতি ভাই চা শ্রমিক তামিলদের নাগরিকত্বের দাবীতে উত্তাল। যা আজ পৃথক তামিল ইলম বা পৃথক তামিলদের রাষ্ট্রের দাবীতে পরিণত। কামান, বন্দুক, বিমানের শব্দে মুখরিত। রক্ত গঙ্গায় স্রোত বইছে। কোন দেশের গৃহযুদ্ধে এত হতাহতের সংখ্যা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। সে বিরল হত্যাকান্ডে নাজেহাল জয়বর্ধনে এক সময় বেসামাল হয়ে পড়েন। তিনিও একটা পথ খুঁজছিলেন। সার্ককে সেই রাস্তা হিসেবেই আঁকড়ে ধরলেন।

নেপাল নরেশ মহারাজা বীরেন্দ্ররও সময় ভাল যাচ্ছিল না। দেশের অভ্যন্তরে আগ্নেয়গিরির শিশু দিন দিন বেড়ে চলেছে। সে বৃদ্ধি রোধ করা যাচ্ছে না। তাতে আবার ভারতের কোন কোন মহলের মদদ আছে। একটা রাস্তা চাই। তিনিও এসে হাজির হলেন সার্কের তরীতে। একইভাবে ভুটান রাজ জিগমে সিংগে ওয়াংচুক হাজির হলেন সেই তরণীতে।

ভারতেও অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফলে দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম হয়েছে। তার উপর প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মদদে একদল বিচ্ছিন্নতাবাদী দেশের উন্নয়নের পথে প্রচন্ড বাধার প্রাচীর তুলতে পেরেছে। পাঞ্জাব, আসামে তা অত্যন্ত প্রকট। দার্জিলিং, বিহার, উত্তর প্রদেশ ও কাশ্মীরে তার প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই অবস্থায় ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধারও চাইছিলেন প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর একটা সহযোগিতার আবহাওয়া। পরস্পর বিরোধী ৭টি দেশের ভিন্ন স্বার্থের তরণী সার্কের যাত্রী হলেন তিনিও।

সার্ক গড়ে উঠলো। তার অগ্রগতির বয়সও থেমে নেই, কিন্তু সার্ক-এর মূল উদ্দেশ্যের কতটুকু পূরণ হয়েছে? সার্কের নামে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে রাষ্ট্রনায়কদের পান-ভোজন, আমলা অফিসারদের বিদেশ ভ্রমণ এবং স্বাগতিক দেশের বড় অংকের অর্থ ব্যয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ তা থেকেছে। বহু আকাংখিত সহযোগিতা হয়েছে উপেক্ষিত। প্রকৃত অর্থে সার্কের আদর্শ বলে বহু ঘোষিত সহযোগিতার পরিবেশ যদি সত্যিই গড়ে উঠতো তাহলে দক্ষিণ এশিয়ার এই অঞ্চলের জনগণের কল্যাণে সরকারগুলো অনেক দূর অগ্রসর হতে পারতো। সেনাবাহিনীর ভারী বুটের আওয়াজে সীমান্ত কেঁপে উঠতো না। কাশ্মীর পাঞ্জাবকে কেন্দ্র করে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে গড়ে উঠতো না তিক্ত সম্পর্কের পরিবেশ। একইভাবে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যেও অনুপ্রবেশ, চোরাকারবার ইত্যাদি নিয়ে দুই দেশের মধ্যে সৃষ্টি হত না তিক্ত সম্পর্কের। ভুটানে রাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ভারত-ভুটান এবং ভুটান-নেপাল সম্পর্কের মধ্যেও ফাটল দেখা দিত না। নেপালে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পূর্বে যেভাবে ভারত-নেপাল সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল তাও সহযোগিতা বা বন্ধুত্বের ছিল না। সার্ক দেশগুলোর মধ্যে সব সময়ই যেন একটা উত্তেজনার পরিবেশ বিরাজ করছে। তা সহযোগিতার পরিবেশ নয়।

আগামীতে অনুষ্ঠিতব্য সার্কের সপ্তম সম্মেলনে ঐ সংস্থার প্রতিষ্ঠাকালীন রাষ্ট্রনায়কদের পাঁচজনকে দেখা যাবে না। বিদেশী চক্রান্তে নিহত হয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। রহস্যজনক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়ক জেনারেল জিয়াউল হক, রাষ্ট্রক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির অভিযোগে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বন্দী জীবনযাপন করছেন। রাষ্ট্র বিপ্লবে নেপাল নরেশ এখন নিয়মতান্ত্রিক শাসক মাত্র। শ্রীলংকার জয়বর্ধনেও রাষ্ট্রনায়কের পদে নেই। আছেন ভুটান রাজ জিগমে সিংগে ওয়াংচুক ও মালদ্বীপের গায়ুম সাহেব। তবে শেষোক্ত দেশ দু'টির সার্কে উপস্থিতি নেহাতই অলঙ্কারিক।

উদ্দেশ্য বিধেয়-এর পালা শেষ। দক্ষিণ এশিয়ার শতাধিক কোটি মানুষের স্বার্থে এখন কি সার্ককে একটি প্রাণবন্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যায় না? দেশের মধ্যেই অবাধ বাণিজ্য, যাতায়াতসহ সহযোগিতার যাবতীয় শর্তগুলো কি পূরণ করা যায় না? মুক্ত করা কি যায় না একটা কাল্পনিক যুদ্ধের ভয় থেকে? তাহলে সহস্রাধিক কোটি টাকা কেবলমাত্র প্রতিরক্ষা খাত থেকেই বেঁচে যাবে। যে অর্থ দিয়ে সার্ক দেশগুলোর অতি প্রয়োজনীয় বেঁচে থাকার চাহিদাই কেবল পূরণ করা সম্ভব হবে তাই নয়, সেই সঙ্গে নতুন সম্পদও সৃষ্টি হবে। এমনিতে এই দেশগুলোর অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ এ অঞ্চলের মানুষের প্রয়োজনে আরও অনেক দিন যোগান দিতে সক্ষম। দেশগুলোর ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রেখে একটা যৌথ বাজার, যৌথ মুদ্রা, যৌথ শিল্পোদ্যোগ, যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে সেটাই হবে সার্কের উদ্দেশ্য সাধনের প্রকৃত পন্থা এবং তা হলে দেশগুলোতে প্রবহমান সাম্প্রদায়িকতার যেমন অবসান হবে তেমনিই গড়ে উঠবে একটা ভ্রাতৃত্বের ভাব। সাতটির মধ্যে যখন ৬টি দেশেই আছে আত্মীয়-বন্ধুর যোগসূত্র এবং এ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে এ অঞ্চলের দেশগুলোতে গড়ে উঠবে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠবে বিরাট শিল্পোদ্যোগ, উন্নত কৃষি এবং বাণিজ্যিক লেন-দেন এবং তাহলে শতাধিক কোটি মানুষের এই আবাসভূমি সাম্রাজ্যবাদী শোষণের মৃগয়াক্ষেত্রে নতুন করে আর পরিণত হবে না। বিশ্বের মহাজনদের গদিতে দাঁড়াতে হবে না বাজারের থলে হাতে করে। সার্ক হবে এক মহাজাতি, এক মহাপরাক্রান্ত জাতি, যার সভ্যতা, ইতিহাস আছে। শিল্প, বাণিজ্য, উন্নত কৃষি, শিক্ষা-সংস্কৃতির ইতিহাস অতি প্রাচীন।

যে ইউরোপীয় জাতিগুলো নানা কারণে যুদ্ধ বিবাদে লিপ্ত থেকেছে, দু'টি বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়েছে, সেই ইউরোপীয় জাতিগুলো আজ শান্তি ও সহযোগিতার পথে আর ধাপ অগ্রসর হল ডাবলিন বৈঠকে। এমনকি ইউরোপের দরিদ্র দেশকে উন্নয়নের জন্য ধনী দেশগুলো তাদের বাজেটে অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাবও গ্রহণ করেছে। সেখানে সার্ক দেশগুলো শান্তি সহযোগিতার পথে অগ্রসর হবে না কেন?